বার বার ঠিকানা খুঁজে ফিরি

কিছুদিন আগে একটা গানের কলি থেকে নিয়ে এ পত্রিকাতেই নিবন্ধের শিরোনাম লিখেছিলাম, 'চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই'। ঠিকানা না জানলেও কিন্তু অনুমেয় ঠিকানাও অনেকটা সঠিক হয়। এ ক্ষমতাটুকু অন্তত বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন। আসলে নদীর উৎপত্তি জানা থাকলে সাগরের ঠিকানাও জানা সম্ভব। তবুও কখনো আমরা ঠিকানা খুঁজে ফিরি। হতে পারে এ ঠিকানা খোঁজা বুঝেও না বোঝার ভান, কিংবা জেগে ঘুমানোর অভিব্যক্তি, অথবা কাউকে ইশারায় ঠিকানা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারণ 'উঠন্তি মূলো তো পত্তনেই চেনা যায়'। সে-জন্যই যত কথা। মূলত আমি একজন সাধারণ শিক্ষক। এদেশে জন্মেছি, এদেশেই বসবাস করি। দেশ আমাকে যেদিকে নিয়ে চলে, সেদিকে চলি। 'কোনো উপায় তো নেই, মধুসূদন!' মাঝে-মধ্যে শাশ্বত শিক্ষকের বার্তা পৌঁছে দিই। দেশের ঠিকানা মানেই আমার ঠিকানা। সেজন্যই ভাবি, আমি কোথায় চলেছি! বেশ কিছুদিন থেকে আমার মাথায় চিন্তা ঢুকেছে, যুবসমাজ ছাড়া কি দেশের ভবিষ্যৎ ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সম্ভব? যুবসমাজকে আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বলি। এদের বর্তমান অবস্থাই-বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। এখানকার ছাত্রছাত্রীরাও যুবসমাজের একটা অংশ। যুবসমাজের দেশপ্রেম, শিক্ষা-দীক্ষা, মন-মানসিকতা, সমাজ গঠনে তাদের অবদান, চরিত্র গঠন, নৈতিকতা, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা– সবকিছুকে নিয়েই দেশের ভবিষ্যৎ আশা-নিরাশা। আমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারিনে। মনে অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। অনেক সময়ই ঢাকার চারপাশে গড়ে-ওঠা উপ-শহরাঞ্চলে যেতে হয়। কখনো কোনো কোনো জেলায় বিভিন্ন কাজেও যেতে হয়। যা দেখি নিজ চোখে দেখি ও নিজ কানে শুনি। দেশের পরিবেশ ও অবস্থা নিয়ে মাথায় ভাবনা চলে আসে। কেন আসে, এর কৈফিয়ৎ দেওয়া অতটা সহজ নয়; তাই এড়িয়ে যাওয়া ভালো। এ কথায় পরে আসছি।

আমাদের ব্যবসার পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। অতীত থেকে আদম ব্যবসা এদেশে চলে আসছে। আদম ব্যবসায়ীর মাধ্যমে যুবসমাজের লাখ লাখ সদস্য বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে গেছে ও যাচ্ছে। বিদেশী মুদ্রা অনেক কষ্টে অর্জন করে দেশে আনছে। দেশে-বিদেশে এ বিষয়ে তাদের ভোগান্তি, শোষণ, প্রতারণা– যা হচ্ছে, আদম-ব্যবসায়ীরা করছে। আমরা দেখছি; ভুগছে যুবসমাজ। ভোগান্তির মাত্রা ও ধরন বিষয়ে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো সম্যক ধারণা নেই। কোনো প্রতিকার আমরা করতে পারিনি। ব্যবসায় স্বচ্ছতা আনতে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ব্যবসাকে আমরা কলুষিত করে ছেড়েছি কিংবা সে অবস্থাতেই চলছে। ব্যবসাটা যুবসমাজ শোষণের আখড়াতে পরিণত হয়েছে। তবুও মানুষ তাদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হচ্ছে। করণ 'গরজ বড় বালাই'। এছাড়া চোখে এমন ব্যবসা দেখছিনা যে, সেখানে খরিদ্দার ঠকানো, দিনে-দুপুরে ডাকাতি হচ্ছে না; এমন পণ্যের বিক্রি এদেশে কম, যাতে ভেজাল নেই। এতে ক্রেতা-সাধারণ রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ছে, অনেকে অকালেই জীবনের অমিয়-সায়রে নৌকা ভাসাচ্ছে। খোঁজ করে দেখার কেউ নেই। দেশটাই চলছে ভেজাল ব্যবসার ওপর। কথা, কাজে, পেশায়, প্রতিটা পদে ভেজাল; ভেজালে সমাজ সয়লাব। কাকে রেখে কাকে দোষ দেবো! জীবনযাপনের জন্য সমাজে চলতে হয়। নিজে পর্যবেক্ষণ করি, সমাজের অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষ কথার মূল্য রাখে। জিহ্বা উলটে ফেলা সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমন কি লিখিত আকারে কথা দিয়ে, সই করেও কথা ঘুরিয়ে ফেলতে দেখছি। যে যুব সমাজ দেশ চালাবে তারা নির্বিকার। সব অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, অনিয়ম গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই সদা প্রশ্ন জাগে, কোথায় চলেছি?

এবার রাজনীতির ধরন-ধারণ, গতি-প্রকৃতির কথা অল্প করে বলি। আমরা রাজনীতিক বলতে এমন একটা সম্প্রদায়কে বুঝি যারা নিজেদের স্বার্থকে ত্যাগ করে জনসেবা ও দেশসেবা করবে। সে আশা-ভরসা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। এ আশা-আকাঙ্ক্ষাই তো আমারা মনের কোণে পুষে রেখেছি। সে আশা-ভরসা তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তো অনেকেই ভোটের স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র নিয়ে সরব হন; উদ্দেশ্য একটাই– দেশসেবা ও সমাজসেবা। এ বিষয়ে আমি কখনো কখনো সরব হলেও মনের কোণে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। কারণ যে বীণা বাজে না, তা কী কাঠের তৈরি, কেমন করে তৈরি, মেসিনে তৈরি, না ছুতার দিয়ে তৈরি– এটা দেখে, বিবেচনা করে কী লাভ? আমাদের এমন বিড়াল প্রয়োজন, যেটি ইঁদুর ধরে। ইঁদুর ধরাটাই তো প্রধান উদ্দেশ্য, নয় কি? বর্তমান এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, জনসেবা ও দেশসেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশের কোনো দলের কেউ রাজনীতি করেন বলে মনে হয় না। কেউ থাকতেও পারেন, সেটা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দিয়ে তো সাধারণ নিয়ম চলে না! তাছাড়া মাস্টার মানুষ হওয়াতে 'মহান রাজনীতিবিদদের' সাথে আমার সখ্য কম। ভেতরের অনেক খবর রাখিনে। জনস্বার্থে ত্যাগের মহিমা নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী কোনো রাজনীতিকের দেখা এদেশে পেলে তাকে 'ফেরেশতা' বলে আমি অভিহিত করতে চাই। এ অভিধা তার জন্য যথার্থ বলে আমার বিশ্বাস। রাজনীতি যারাই করেন, পদাধিকারী হন, তাদের অধিকাংশই তো যুবসমাজের অংশ। তাদের কাজ-কারবার অনেকটাই বলে দেয় ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ধারা কোন দিকে গড়াবে। বলে দেয়, এদেশের রাজনীতির অভিমুখিতা কোন দিকে। প্রতিদিনের পত্রিকা আরো এ-সম্প্রদায় সম্পর্কীত শতেক খবর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ থেকে এটুকু বোধ জন্মেছে যে, যে দলই ক্ষমতায় আসুক বা থাকুক, এদেশের রাজনীতি হয়ে গেছে ব্যবসাভিত্তিক। যে কোনো ব্যবসাতে ভালো লাভ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের রাজনীতি করা অবশ্যম্ভাবী। রাজনীতির সুনজর ছাড়া তো কোনো ভালো ব্যবসা এদেশে চলছেও না। বাস্তবতাকে অস্বীকার করি কী করে? সে আশা নিয়েই তো যুবসমাজ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে দলে দলে রাজনীতিতে ঢুকছে। সব ব্যবসাসহ বিশ্ববিদ্যালয়েও তো একই অভিমুখিতা দেখতে পাচ্ছি। একটা দেশে মানুষই সর্বেসর্বা। মানুষের সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ বসবাস, সুস্থ ও মনুষ্যত্ববোধ-সম্পন্ন চিন্তাধারা, সুশিক্ষাসহ সুনাগরিক হয়ে সাধারণ জীবনযাপনই সবার প্রত্যাশা। এর ব্যতিক্রম হলেই যত আপদ-বালাই, অশান্তির নরক-গুলজার দেশের দিকে ধেয়ে আসে; চারদিক তাকিয়ে যা নিত্য চোখে পড়ছে।

একাত্তরের স্বাধীনতার পর থেকেই যে সরকার যতবার দেশ পরিচালনা করেছে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তেপ্পান্ন বছরের পর উন্নতির অবস্থা তো আমরা সবাই স্বচোক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এ উন্নতিকে অস্বীকার করি কি করে! সঠিক তথ্য আমার জানা নেই, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যতটুকু শুনছি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলছে, শিক্ষার সার্টিফিকেট দেখিয়ে যে-সব যুবক-যুবতী বিসিএস পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করছে, এদের অধিকাংশ অনুপযুক্ত। তাই চার লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে হয়তো বড় জোর দশ হাজার প্রতিযোগীকে পাশ করিয়ে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে অংশ নিতে বলা হচ্ছে। এদের অধিকাংশের মানও আশানুরূপ নয়। এসব তথ্য দেশের শিক্ষার মান নিয়ে একটা সাধারণ ধারণা দেয় তো বটেই। আমরা হয়তো এসব কথা পাশ কাটিয়ে সামনে ধেয়ে চলি। যারা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হচ্ছে, যে যুবসমাজের ওপর দেশ নির্ভর করতে পারে, তাদের বেশিরভাগ পশ্চিমা-বিশ্বে পাড়ি দিয়ে দেশে আর ফিরতে চাচ্ছে না। তাদের ঠিকানা আমরা পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের ও দেশের ঠিকানা কোথায়? মাশাআল্লাহ প্রতিটা জেলায় একটা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় হয়ে গেছে অথবা হতে চলেছে। অচিরেই শিক্ষার্থীর অভাব হলেও সার্টিফিকেটের অভাব হবে না। সবকিছুই হচ্ছে তো যুবসমাজকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ার লক্ষ্যে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে বেশি কথা বলার অবকাশ নেই। ১০৮টা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বড় জোর ৮টা বিশ্ববিদ্যালয়ে

লেখাপড়া কিছুটা হলেও হতে পারে, বাকি ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নিছক কোচিং ব্যবসার শামিল। এদের অনেকেই আগে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। অন্যরা বাকিদের দেখাদেখি কোচিং ব্যবসাতে যুক্ত হয়েছে। মূলত এদেশ সব বিষয় নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসাতে ডুবে গেছে। ব্যবসারও একটা নীতি-নৈতিকতা থাকে, সেটাও চলতে পথে কোথাও ঝরে পড়েছে। স্কুল-কলেজে নোট মুখস্ত ও টিক-চিহ্ন ছাড়া কোনো লেখাপড়া নেই। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসেই হঠাৎ করে এত বিদ্যাজ্ঞান মাথায় আসবে কোত্থেকে? সুতরাং স্কুল-কলেজে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে শিক্ষার মানোন্নয়নের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ব্যর্থতার জন্য মাত্র দুটো বিষয়কে আমি দায়ী করি। একথা শুনে অনেক সতীর্থ আমার প্রতি নাখোশ হতে পারেন, কিন্তু ঘটনা সত্য। এক হচ্ছে– শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসা। এ ব্যবসা থেকে শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনাটা অত সহজ না। আইন ইচ্ছে করলে অনেক করা যাবে, কিন্তু সুষ্ঠু বাস্তবায়ন অনেক কঠিন। গভীর ক্ষতের ওপর মলম মালিশ সম্ভব। দুই হচ্ছে– শিক্ষার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা। এদেশের প্রতিটা গ্রামে-গঞ্জের রাজনৈতিক পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে; কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। নীতি-নৈতিকতাহীন যুবসম্প্রদায়ই এসব করছে, আবার ফলও এদেরকেই ভোগ করতে হচ্ছে। ঘরে আগুন লাগায় এক জন, পুড়ে মরে দশ জন। দেশব্যাপী হাজারে হাজার কিশোর গ্যাংয়ের অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত কাগজে পড়ছি। তাদের কর্মকাণ্ডও আমরা দেখছি। এরাই তো ভবিষ্যৎ যুবসমাজ। এদেশের মহান রাজনীতিবিদরা যুবসমাজ নিয়ে নীতিহীন, চরিত্র-হননের মুখসর্বস্ব ব্যবসায় নেমেছেন, ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে ও হবে, যেমন রাজনৈতিক আনুকূল্যে ব্যাংক-ব্যবসা, কৌশলী বুদ্ধি, টাকা পাচার দেশের অর্থনীতি সমূলে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। কোন সেক্টরকে বাদ দিয়ে কোনটাকে বলবো! সর্বত্র একই অবস্থা– দুর্নীতি, লুটপাট আর নীতিহীনতা। মূলত জনগোষ্ঠী হাজামজা হয়ে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, এ তেপ্পান্ন বছরে জীবনমুখী, মানবতা-জাগানিয়া ও কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ে যাদের জনসম্পদে রূপ নেওয়ার কথা ছিল।

আগে ভাবতাম, এদেশের ৯০ শতাংশ লোক মুসলমান। এ ধারণা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছি। অনেক জায়গায় লিখেছি যে, মুসলমান পোশাকে ও নামে নয়; মুসলমান তার কথা-কাজ ও চিন্তা-চেতনায়, দায়িত্ব পালনে, বৈশিষ্ট্যে। কেউ কষ্ট পেলেও সত্য যে, সে বিবেচনায় আমাদের দেশের অধিকাংশ নামধারী মুসলমান মুসলমানের কাতারে আসে না। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় পড়লাম, বিশ্বের অনেক নন-মুসলিম দেশ আমাদের দেশ ও আরো অনেক মুসলিম দেশের তুলনায় মুসলমানসুলভ কর্মকাণ্ড, মানবিক বৈশিষ্ট্যে, দায়িত্ব পালনে ও চিন্তাচেতনায় তালিকার প্রথম দিক থেকে ক্রমানুযায়ী অনেকদূর দখল করে রেখেছে। সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর কোনো কোনো দেশ এগিয়ে। আমাদের অবস্থান শেষের দিকে। সে-দেশের অনেক নন-মুসলমান হয়তো পরকালে বিশ্বাস রাখতে পারেন না, কিন্তু একজন মুসলমানের দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম, নীতি-নৈতিকতা ও চিন্তাচেতনার বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তারা মানুষ হিসেবে সেগুলোর অনেকটাই করেন। সঠিক পরিসংখ্যান দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায়ই যেতে হয়। বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরেও যেতে হয়। সব অঞ্চলেই শহরের চারপাশে রিসোর্ট ব্যবসা নামে নতুন ব্যবসা গজিয়েছে। অতি উপভোগ্য ব্যবসা। যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে কোনো কোনো পরিবার সেখানে গিয়ে দিবা-রাত্রি যাপন করে। রিসোর্ট-ব্যবসা পরিবারের রাতযাপন ও বেড়ানোর চেয়ে যুবসমাজের অসামাজিক কার্যকলাপের আড্ডাখানা হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অনৈতিক ব্যবসাতে এদেশে এখন আর ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। এটা যুবসমাজ উচ্ছন্নে যাওয়ার উৎকৃষ্ট ও নিরাপদে পাতা ফাঁদ। হাতে মোবাইল ফোনের ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়পর্ব। কোকিল-কণ্ঠি গলা, 'বোতল-ফুঁস'-এর মাধ্যমে গলা ভেজানোর সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খল বাহিনীর নিরাপদ পাহারা। সুন্দর-সুপরিপাটি

পরিবেশে স্থানীয় রাজনৈতিক মস্তান, দালাল ও আইন রক্ষাকর্তাদের ম্যানেজ করে যুবসমাজের অবিরাম চরিত্রহননের সুযোগ। দেশের উদ্দেশে বলতে ইচ্ছে করে, 'হায় রে তোমার পিরিতের এত জ্বালা রে বন্ধু, আগে তো না জানি-ই...'। আমার প্রশ্ন, যুবসমাজ কোন ঠিকানায় গিয়ে চরিত্র বাঁচাবে? জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।

(২৩ মে ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ